যুগান্তর

বৃহস্পতিবার, ৯ শ্রাবণ, ১৪১৫
Thursday, 24 July, 2008

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কিছু প্রস্তাব

শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে সমাজে বাল্যবিবাহ বন্ধ হচ্ছে না। বাল্যবিবাহের সুদূরপ্রসারী ফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

আইনগতভাবে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ ও ছেলেদের ২১। এ বয়স নির্ধারণের পেছনে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আছে। এ বয়সের আগ পর্যন্ত ছেলে ও মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা পরিণত ও পরিপক্ব হয় না। ফলে এ বয়সের আগে কোন দম্পতি যদি বৈবাহিক জীবন শুরু করে এবং সন্তানের জন্ম দেয়, তবে সেই সন্তান বিভিন্ন দিক থেকে অপরিণত ও অপরিপক্ব হয়ে জন্ম নেয়। অনেক সময় তারা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পরিবার ও সমাজের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার খুব বেশি। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বাল্যবিবাহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সিংহভাগ জনসংখ্যা অধ্যুষিত গ্রামবাংলায় বাল্যবিবাহ পুরোদমে চলছে। মেয়েরা এর শিকার হচ্ছে বেশি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইনের অপ্রতুলতা, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এর প্রধান কারণ। এ কারণগুলো একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত। গ্রাম এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি এবং সেখানে দারিদ্র্যও প্রকট। একটি পরিবারে যখন অধিক সন্তানের জন্ম হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই পিতা-মাতা সন্তানদের ভরণপোষণের সমস্যায় পড়েন। এছাড়া এসব পরিবারে ছেলেসন্তানদের সংসারের হাল ধরার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং মেয়েদের বোঝা হিসেবে ধরা হয়। তাই পিতার চেষ্টা থাকে কত দ্রুত মেয়েকে পাত্রস্থ করে বোঝামুক্ত হওয়া যায়। শিক্ষার অভাবে এসব বাবা-মা বোঝেন না যে, এ ধরনের বিয়ের পরিণতি ইতিবাচক হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা আবার সন্তানসহ বাবার সংসারে ফিরে এসে দ্বিগুণ বোঝা হিসেবে চেপে বসে।

বাল্যবিবাহের পরিণতি শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক— সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ফল বয়ে আনে।

যেসব মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয় তাদের

সঙ্গে স্বামীর বয়সের পার্থক্য বেশি থাকে। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামী-সংসারের সঙ্গে উপযোজনে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় অপরিণত বয়সে অধিক সন্তানের জন্ম দেয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভূমিকায় যথাযথভাবে অবতীর্ণ হতে না পারায় স্বামীরা স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বহুবিবাহে অভ্যস্ত হয়ে স্ত্রী-সন্তান পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্ত স্ত্রী-সন্তান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা-ভাইয়ের সংসারে ফিরে আসে। এসব মেয়ে স্বামীর ঘরেও নিগৃহীত হয়, পিতা-মাতার সংসারে এসেও নিগৃহীত-নির্যাতিত হয়। অর্থাৎ নির্যাতন-যন্ত্রণা এসব মেয়ের নিত্য সাথী হয়ে দাঁড়ায়। তাদের জীবন তো নিগৃহীত হয়ই, উপরন্তু তাদের যে সন্তান থাকে এবং ওই সন্তানের মধ্যে যদি মেয়ে সন্তান থাকে এরা একই শৃঙ্খলে ঘুরপাক খেতে থাকে। এ শৃঙ্খল থেকে যেন তাদের মুক্তি নেই।

বাল্যবিবাহের প্রথম শিকার শিশু, দ্বিতীয় শিকার নারী এবং তৃতীয় শিকার সমাজ। এর সুদূরপ্রসারী ফল প্রকারান্তরে পুরো জাতির ওপর গিয়ে পড়ে। তাই এ অশুভ পরিণতি থেকে গোটা জাতিকে মুক্ত করার জন্য আমাদের তৎপর হতে হবে। শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই মূলত এখান থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জন্ম নিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এর দ্বারা বিয়ের বৈধ বয়স প্রমাণ করা যাবে, তাই জন্ম নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলক করে বিয়ের সময় জন্ম সনদ উপস্থাপনকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। রেজিস্ট্রি অফিস থেকে প্রতিবছর অডিটের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে বিয়ের সময় বয়স বাড়িয়ে দেয়ার সুযোগ না থাকে। একই সঙ্গে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সব বিবাহের রেজিস্ট্রেশন হয় না। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বয়সের শর্তারোপ তথা জন্ম সনদ বাধ্যতামূলক করা হলে এ ব্যাধি ক্রমশ নির্মূল হবে। এ ব্যাপারে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

ইয়াসমীন আরা লেখা
ডিন, স্কুল অব অ্যাডুকেশন এন্ড ফিজিক্যাল অ্যাডুকেশন, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা